ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1449-1458
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.366

পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও রূপান্তর পর্যালোচনা

সেখ সুজাউদ্দিন, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The rationing system— that is, the distribution of foodgrains at government-controlled prices— is an inseparable part of West Bengal's socioeconomic structure. Rationing is not merely a technical exercise in food distribution; it is a state intervention that temporarily reduces economic inequality in society. This essay seeks to analyze that system not just from an administrative policy perspective, but in the context of economic disparity, labor market pressures, social stratification, and the power relationship between the state and its citizens. From the great famine of 1943 to the free ration scheme of 2024 — at every stage, this essay fundamentally examines how the system was built, whose interests it served, where it failed, and how it can become more effective and equitable in the future.

Keywords: Rationing System, Food Distribution, Great Famine, Free Ration, Food Security, Government Policy, BPL

খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি মূলত একটি অর্থনৈতিক প্রশ্ন। কোনো সমাজে যথেষ্ট খাদ্য আছে কি না, সেটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো— সেই খাদ্য কেনার ক্ষমতা সবার আছে কি না। অর্থনীতির ভাষায়, এটা 'Supply' নয়, 'Entitlement' বা 'Purchasing Power'-এর প্রশ্ন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে আধুনিক কালের বড় দুর্ভিক্ষগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাদ্যের পরম ঘাটতির কারণে হয়নি— হয়েছে দরিদ্র মানুষের হাতে খাদ্য কেনার সামর্থ্য ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেশনিং ব্যবস্থাকে দেখলে বোঝা যায়— এটি বাজারের ব্যর্থতা সংশোধনের একটি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। বাজার যখন দরিদ্র মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দিতে পারে না, তখন রাষ্ট্র ভর্তুকিমূল্যে বা বিনামূল্যে সেই কাজটা করে। কিন্তু রাষ্ট্র নিজেও নিরপেক্ষ নয়— রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করেন নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ সেখানে কাজ করে। তাই রেশনিং ব্যবস্থার বিশ্লেষণে বাজার, রাষ্ট্র এবং সমাজ— এই তিনটিকে একসাথে দেখতে হয়। এই বিশ্লেষণের জন্য এটি হল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি। কারণ এই রাজ্যে আছে ঔপনিবেশিক শিল্পের উত্তরাধিকার, দেশভাগের বিশাল সামাজিক ক্ষত, বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসন, এবং বর্তমানের তৃণমূল সরকারের কল্যাণ রাজনীতি— এই সব মিলিয়ে রেশনিং ব্যবস্থার একটি জটিল, বহুস্তরীয় ইতিহাস তৈরি হয়েছে।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ:

(ক) ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি-অর্থনীতি:

ব্রিটিশ আমলে বাংলার কৃষি-অর্থনীতি একটি ঔপনিবেশিক নির্যাসরূপী কাঠামোয় আটকে ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ভূমির উপর জমিদারদের নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছিল, কিন্তু কৃষককে দিয়েছিল সীমাহীন শোষণের সুযোগ। বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের কোনো আইনি সুরক্ষা ছিল না, ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না, এবং দুর্যোগের সময় রাষ্ট্রের কাছে কোনো দাবি করার অধিকার ছিল না। এই কাঠামোয় কৃষকের কাছে খাদ্য থাকার সম্ভাবনা সর্বদাই ক্ষীণ ছিল। বাজারে ফসলের দাম বাড়লে তারা উপকৃত হতেন না কারণ ফসলের বড় অংশ খাজনা হিসেবে বেরিয়ে যেত। দাম কমলে সর্বনাশ। মন্দার সময় সঞ্চয় ছিল না, ঋণ মেটানোর চাপ ছিল প্রচণ্ড। এই আর্থিক ভঙ্গুরতার প্রথা ভিন্ন রুপে ১৯৪৩ সালে মানুষকে মারণ দুর্ভিক্ষের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

(খ) ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ: বাজার ব্যর্থতার চরম পরিণতি:

অমর্ত্য সেন তাঁর Poverty and Famines (১৯৮১) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৯৪৩ সালে বাংলায় মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৯৪১ সালের চেয়ে কম ছিল না। অর্থাৎ শস্যের পরম ঘাটতি ছিল না। তাহলে মানুষ মারা গেল কেন? কারণ যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতিতে চালের দাম হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। যে মৎসজীবী, তাঁতি বা কৃষিমজুর আগে ন্যায্যমূল্যে চাল কিনতে পারতেন, তার ক্রয়ক্ষমতা রাতারাতি শেষ হয়ে গেল। বাজারে চাল ছিল, কিন্তু তা কেনার সামর্থ্য তাদের হাতে ছিল না। এর পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের কিছু ভ্রান্ত নীতিও বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে খাদ্যবাহী জাহাজ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ফলে সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল। কিছু অঞ্চলে সরকার খাদ্যশস্য বাজার থেকে কিনেছিল সামরিক প্রয়োজনে, যা বাজারমূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সবচেয়ে বিকৃত রূপ যা ছিল বাজারকে সংশোধন নয়, বরং আরও বিপজ্জনক করে তোলা। এই ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের সমাজমানসে একটি গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। সেই ক্ষত থেকেই জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্রের কাছে খাদ্য-নিরাপত্তার দাবির একটি তীব্র আবেগ। স্বাধীনতার পরের প্রতিটি সরকারকে সেই দাবির মুখোমুখি হতে হয়েছে। অর্থাৎ এটি পরিস্কার বাজার একা কখনো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। বিশেষত সংকটের সময়ে বাজার মূল্য বাড়িয়ে দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে। তাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অপরিহার্য — তবে সেই হস্তক্ষেপ যদি সঠিক না হয়, সেটিও বিপর্যয় ডাকতে পারে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্থনৈতিক কাঠামো (১৯৪৭–১৯৬৭):

(ক) শিল্প-কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও শ্রমিকের খাদ্য:

স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা বন্দর, হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, উত্তর কলকাতার পাট শিল্প, হুগলির বস্ত্র শিল্প— এই সব মিলিয়ে একটি বিশাল শিল্পশ্রমিক শ্রেণি তৈরি হয়েছিল। এই শ্রমিকরা শহরে বাস করতেন, কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ বেতননির্ভর। বাজারে খাদ্যমূল্য বাড়লে তাদের মজুরি কমে যায়, যা শ্রমিক অসন্তোষ ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণ হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাই শিল্পশ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা ছিল মূলত উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণের একটি পরোক্ষ উপায়। ভর্তুকিমূল্যে খাদ্য দিলে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির চাপ কমে, কারখানার মালিক কম খরচে উৎপাদন চালাতে পারে, এবং রাষ্ট্র শিল্পের মুনাফা ধরে রাখতে পারে। এটি ছিল একটি ত্রিপক্ষীয় অর্থনৈতিক বোঝাপড়া— যেখানে শ্রমিকের কল্যাণ প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়, শিল্পের স্থিতিশীলতা ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

(খ) গ্রামীণ অর্থনীতির বঞ্চনা:

একই সময়ে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের বিশাল কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী রেশন ব্যবস্থার বাইরে ছিলেন। তাঁরা খাদ্য উৎপাদন করতেন, কিন্তু নিজেরা খাদ্য নিরাপত্তার বাইরে ছিলেন। ভাগচাষি বা বর্গাদাররা ফসলের অর্ধেক জমিদার বা মহাজনকে দিয়ে দিতেন। বাকি যা থাকত, তা দিয়ে সারা বছর চলত না। ফলে তাঁরাও বাজার থেকে চাল কিনতেন — এবং চালের দাম বাড়লে তাঁরাও দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হতেন। এই বৈষম্যের একটি স্পষ্ট আর্থনৈতিক ব্যাখ্যা হল রাষ্ট্রের কাছে শহরের শিল্পশ্রমিকের অর্থনৈতিক মূল্য গ্রামের ভাগচাষির চেয়ে বেশি বলে মনে করা হত। পুঁজিবাদী শিল্পায়নের যুক্তিতে শহরকে অগ্রাধিকার দেওয়া স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। এই শহুরে পক্ষপাত পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যনীতিতে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান ছিল।

(গ) দেশভাগের অর্থনৈতিক ধাক্কা:

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, পাটের কল কলকাতায় ছিল কিন্তু পাটের প্রধান উৎপাদনস্থল চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে ফলে কাঁচামালের সংকট দেখা দিল। দ্বিতীয়ত, কোটি কোটি শরণার্থী এসে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমবাজার, আবাসন ব্যবস্থা ও খাদ্যসরবরাহের উপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করলেন। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সামাজিক ব্যয়ের উপর এক বিশাল বোঝা পড়ল, যা রেশনিং ব্যবস্থা পরিচালনার সক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। শরণার্থীদের জন্য কোনো সংগঠিত রেশন ব্যবস্থা ছিল না। তাঁরা ছিলেন কার্যত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্বাস্তু — নতুন পরিচয়ে নতুন দেশে, কোনো সম্পদ ছাড়া, কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়া। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে কখনোই হয়নি — তাঁদের বংশধরেরা আজও পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম মানুষদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন: শ্রেণি সংঘাত ও খাদ্য অধিকার

খাদ্যের দাবি যখন রাজনৈতিক রূপ নেয়, তখন সেটি শুধু পেটের প্রশ্ন থাকে না— হয়ে ওঠে মর্যাদার প্রশ্ন, নাগরিকত্বের প্রশ্ন। ১৯৫৯ সালের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে সেই রূপান্তরের একটি প্রতীকী বিশেষ মুহূর্ত। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল, সেটিকে সাধারণত রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এর পেছনে একটি স্পষ্ট আর্থনৈতিক কারণ ছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে কলকাতায় চালের দাম হঠাৎ বেড়ে গেল সেই সময় একটি পরিবারের মাসিক চালের খরচ তাদের মোট আয়ের বড়

একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারি অপর্যাপ্ত রেশন সরবরাহ, বাজারে দাম আকাশছোঁয়া — এই অবস্থায় নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে প্রকৃত সংকট দেখা দিয়েছিল। আন্দোলনটি দেখিয়ে দিল যে শহরের দরিদ্র মানুষ, বিশেষত অসংগঠিত খাতের শ্রমিকরা, বাজারের স্বেচ্ছাচারিতার সামনে সম্পূর্ণ অসহায়। তাঁদের কোনো সঞ্চয় নেই, কোনো বিকল্প নেই, এবং রাষ্ট্রের কাছে কার্যকর দাবি করার সংগঠিত মঞ্চ নেই। বামপন্থী দলগুলি সেই অসহায়ত্বকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিল— এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলেন যে খাদ্যের দাবি একটি রাজনৈতিক অধিকার। ৩১ আগস্ট লক্ষাধিক মানুষের 'খাদ্য চাই ,খাদ্য দাও' সরবের ব্যাপক আন্দোলনে পুলিশের গুলিচালনা এবং মানুষের মৃত্যু সেই সময়ের কংগ্রেস সরকারের একটি গভীর শ্রেণি-অবস্থানকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। যে সরকার দরিদ্রের খাদ্যের দাবির বিরুদ্ধে গুলি চালায়, সে সরকার কার পক্ষে— এই প্রশ্নটি পরবর্তী দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে বামদিকে টেনে নেওয়ার একটি কারণ হয়েছিল।

বামফ্রন্টের রেশন-অর্থনীতি (১৯৭৭–২০১১):

(ক) ভূমি সংস্কার ও রেশনিং: একটি সমন্বয়ী কৌশল:

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর দুটি নীতি একসাথে চলল- ভূমি সংস্কার ও রেশনিং সম্প্রসারণ। এই দুটো আলাদা মনে হলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে একই লক্ষ্যে কাজ করেছে- গ্রামীণ দরিদ্রের কাছে অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বণ্টন। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গাদার তাদের চাষের অধিকার নথিভুক্ত করালেন। এতে তাঁদের আয় কিছুটা বাড়ল, কারণ আর ফসলের বড় অংশ জমির মালিককে দিতে হয় না। অন্যদিকে রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীণ পরিবারে খাদ্যব্যয়ের উপর চাপ কিছুটা কমল। এই দুটো মিলিয়ে বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মানুষের মাথাপিছু প্রকৃত আয় কিছুটা বেড়েছিল— এটি অনেক গবেষণায় নথিভুক্ত। তবে এই উন্নতির একটি সীমা ছিল। ভূমি সংস্কার মূলত ছিল 'Asset Redistribution'— সম্পদের বণ্টন, কিন্তু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল— সেচ, সার, প্রযুক্তি, বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগ— সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আসেনি। ফলে বর্গাদার কিছুটা বেশি পেলেও, কিন্তু প্রাথমিকভাবে দরিদ্রই রইলেন।

(খ) পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও রেশনিংয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতি:

বামফ্রন্ট আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে রেশনিং পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের হাত থেকে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কিছুটা ক্ষমতা এসেছিল। তাত্ত্বিকভাবে এটি গণতান্ত্রিক একটি পদক্ষেপ— যদি স্থানীয় মানুষ পঞ্চায়েত সদস্যকে চেনেন ও চাপ দিতে পারেন, তাহলে রেশন বিতরণে স্বচ্ছতা বাড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে যা হল তা অর্থনৈতিক ভাষায় হল 'Rent-Seeking Behaviour'— যখন রাজনৈতিক সংযোগই অর্থনৈতিক সুবিধার নির্ধারক হয়ে ওঠে, তখন সবচেয়ে দরিদ্র মানুষ— যাঁর রাজনৈতিক সংযোগ নেই— খুব সুবিধাভোগী হন না ।

(গ) কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও রাজ্যের সক্ষমতা:

বামফ্রন্ট সরকারের একটি দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগ ছিল যে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে প্রাপ্য বরাদ্দ দিচ্ছে না। এই অভিযোগের কিছুটা সত্যতা আছে— কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় থাকা দলগুলি রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রভাবিত করেছে, এটা রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি পরিচিত বাস্তবতা। কিন্তু একটি আর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এও দেখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ নিজে তার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছিল কিনা। সবুজ বিপ্লব পাঞ্জাব-হরিয়ানায় যেভাবে কৃষিতে রূপান্তর এনেছিল, পশ্চিমবঙ্গে সেটা হয়নি। বর্ধমান জেলায় কিছুটা সাফল্য এলেও রাজ্যজুড়ে কৃষি উৎপাদনশীলতায় আমুল পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে রেশন সরবরাহের জন্য কেন্দ্রনির্ভরতা কমেনি।: বামফ্রন্ট একদিকে সার্বজনীন রেশনের দাবি তুলেছিল, কিন্তু কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে রেশন সরবরাহের স্বনির্ভর ভিত্তি তৈরিতে বিনিয়োগ করেনি। এই দ্বন্দ্বটি দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-অর্থনীতিকে দুর্বল রেখেছে।

উদারীকরণ ও TPDS: বাজার ও সামাজিক ন্যায়ের দ্বন্দ্ব

(ক) ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাব:

১৯৯১ সালের উদারীকরণের পর ভারতের খাদ্য বাজারে ধীরে ধীরে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়তে লাগল। সুপারমার্কেট, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের কোম্পানি, খুচরা— এই সব শহরের মধ্যবিত্ত বাজারে ছেয়ে গেল। এই নতুন বাজারে মধ্যবিত্তের আয়ও বাড়ল, তারা রেশন দোকান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু উদারীকরণের সুফল সমানভাবে বিতরিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্প ধসে পড়ল, পুরনো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলো বন্ধ

হতে লাগল। এই 'Deindustrialisation'-এর ফলে বহু শ্রমিক পরিবার হঠাৎ আয়হীন হলেন। তাঁরা অসংগঠিত খাতে চলে যেতে থাকলেন— রিকশা, হকারি ও জোগাড়— যেখানে আয় অনিশ্চিত। এই মানুষগুলোর কাছে রেশন আরও বেশি দরকারি হয়ে উঠল।

(খ) TPDS: টার্গেটিংয়ের অর্থনৈতিক যুক্তি ও সামাজিক বিপদ:

ভারতের সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার ইতিহাসে ১৯৯৭ সালে চালু হওয়া লক্ষ্যভিত্তিক সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা (TPDS) একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এর আগে সর্বজনীন PDS-এর মাধ্যমে সকলের কাছে রেশন পৌঁছানোর চেষ্টা হলেও তা অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে কেবল দারিদ্রসীমার নিচের (BPL) পরিবারগুলোকে বিশেষ ভর্তুকি দেওয়া হবে। এর পিছনে যুক্তি ছিল— বাজেটের প্রতিটি টাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যার কাছে তার কাছেই যাওয়া উচিত। কিন্তু এই যুক্তির একটি সমস্যা হল, যেটাকে অর্থনীতির ভাষায় 'Targeting Error' বলে। বাস্তবে দুই ধরনের ভুল হয়: প্রকৃত দরিদ্র বাদ পড়ে যায় এবং অ-দরিদ্ররা সুবিধা পায় । পশ্চিমবঙ্গে দুটো ভুলই ঘটেছে, কিন্তু প্রথমটি বেশি ক্ষতিকর— কারণ যে মানুষটা সত্যিই খেতে পাচ্ছেন না তিনি সুবিধাবঞ্চিত হলে তার শরীর ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ ও পশ্চিমবঙ্গে তার বাস্তবায়ন

(ক) আইনের আর্থনৈতিক তাৎপর্য:

২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (NFSA) ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার খাদ্যকে একটি আইনি অধিকারে পরিণত করল। দেশের ৬৭ শতাংশ মানুষ— গ্রামে ৭৫ শতাংশ, শহরে ৫০ শতাংশ— প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫ কেজি শস্য পাওয়ার অধিকার পেলেন। চালের দাম মাত্র ৩ টাকা, গম ২ টাকা কেজি। আর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এই আইনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো এটি 'Entitlement'-কে আইনি মর্যাদা দিল। আগে রেশন ছিল সরকারের অনুগ্রহ— যখন খুশি দেওয়া, যখন খুশি কমানো। এখন এটি আইনি অধিকার— না পেলে আদালতে যাওয়া যাবে। এই পরিবর্তনটি সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর- এটি নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে। পশ্চিমবঙ্গে NFSA বাস্তবায়নে কিছু অনন্য সমস্যা দেখা গেছে। উপকারভোগীর তালিকা তৈরিতে রাজ্য এখনো ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিকেই মূলত ব্যবহার করছে। এই এক দশকেরও বেশি সময়ে শহরে অভিবাসন হয়েছে, নতুন দরিদ্র তৈরি হয়েছে, কেউ কেউ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়েছেন তাই এই গতিশীলতাকে স্থির তালিকায় রাখা যায় না।

(খ) খাদ্য সাথী:

তৃণমূল সরকার ২০১৬ সালে খাদ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে NFSA-র আওতার বাইরে , রাজ্যের নিজস্ব বরাদ্দ থেকে আরও মানুষকে রেশনের সুবিধা দেওয়া শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের প্রায় ৮.৫-৯ কোটির বেশি মানুষকে খাদ্য সুরক্ষার আওতায় আনা এবং কাউকে খাদ্যশস্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। আর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— রাজ্য বলছে, কেন্দ্র যতটুকু দেয়, তার চেয়ে বেশি মানুষের দরকার আছে এবং রাজ্য নিজে সেই দায়িত্ব নিচ্ছে। তবে এই বাড়তি ব্যয়ের একটি অর্থনৈতিক চাপও আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ঘাটতি দীর্ঘকাল ধরে উচ্চ। খাদ্য ভর্তুকির উপর বাড়তি ব্যয় মানে হতেই পারে অন্য খাত যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো থেকে অর্থ সরানো। এটি এমন একটি পদ্ধতি যা দীর্ঘমেয়াদে বিবেচনা করা দরকার। স্বল্পমেয়াদে মানুষের পেটে ভাত দেওয়া জরুরি, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ না হলে দারিদ্র্যের মূল কারণ সমাধান হয় না।

সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অর্থনৈতিক কাঠামো

(ক) একটি রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামো:

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থার সরবরাহ শৃঙ্খল শুরু হয় কেন্দ্রীয় সংস্থা Food Corporation of India (FCI)-এর মাধ্যমে, যেখানে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে শস্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তর সেই শস্য গ্রহণ করে জেলাভিত্তিক গুদামঘরে সংরক্ষণ করে। জেলা থেকে পাইকারি ডিপোর মাধ্যমে শস্য পৌঁছায় স্থানীয় ন্যায্য মূল্যের দোকানে । সেখান থেকে রেশন কার্ড ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষ নির্ধারিত পরিমাণ চাল ও গম সংগ্রহ করেন। পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থার সরবরাহ শৃঙ্খলটা দেখতে অনেকটা এরকম : ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) → রাজ্য গুদাম → জেলা ডিপো → রেশন ডিলার → উপকারভোগী। প্রতিটি ধাপে যদি সামান্য করেও লিকেজ হয়, তাহলে মোট ক্ষতি বিশাল হতে পারে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় 'Leakage Rate' পরিমাপের চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে ভারতে সামগ্রিকভাবে রেশন শস্যের ৩৫-৪৫ শতাংশ লিকেজ হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই হার কম বা বেশি — নিখুঁত পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন কারণ কোনো সরকারই এই তথ্য স্বেচ্ছায় প্রকাশ করে না।

লিকেজ শুধু সরাসরি চুরি নয়— এটি বিভিন্ন রূপে হয়। ওজনে কম দেওয়া, নিম্নমানের শস্য প্রতিস্থাপন, মৃত বা চলে যাওয়া পরিবারের কার্ডে শস্য তোলা, 'Ghost Ration Shop' যেটা কাগজে আছে কিন্তু বাস্তবে নেই— এই প্রতিটি পদ্ধতি অর্থনৈতিক দুর্নীতির আলাদা রূপ।

(খ) রেশন ডিলারের অর্থনৈতিক বাস্তবতা:

রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করার আগে তাদের অর্থনৈতিক বাস্তবতাটা বোঝা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে রেশন ডিলাররা প্রতি কুইন্টাল খাদ্যশস্য বিতরণের বিপরীতে সরকার নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট কমিশন পান, যা সাধারণত বিতরণের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে এই কমিশনের হার অত্যন্ত কম থাকায় ডিলাররা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করে আসছেন। কম কমিশনের কারণেই অনেক ডিলার অতিরিক্ত আয়ের জন্য কালোবাজারি ও শস্য চুরির দিকে ঝুঁকে পড়েন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প চালু হওয়ার পর ডিলারদের আয় আরও কমে যায়, কারণ বিক্রয়মূল্য শূন্য হলে কমিশনের ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে রেশন ডিলারদের কমিশন কাঠামো পুনর্বিবেচনা না করলে সরবরাহ শৃঙ্খলের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি ক্রমশ অকার্যকর হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এটি ব্যক্তিগত নৈতিকতার ব্যর্থতা নয়, একটি বিকৃত অর্থনৈতিক কাঠামোর ফলাফল। সমাধান তাই শুধু ডিলারদের শাস্তি দেওয়া নয়— কমিশন কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে সৎভাবে কাজ করা আর্থিকভাবে সম্ভব করা। এই সহজ অর্থনৈতিক সমাধানটি বহু বছর ধরে সুপারিশ হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

তথ্যপ্রযুক্তিকরন: প্রযুক্তির অর্থনীতি ও সামাজিক বিভাজন

(ক) ePOS ও আধার: সংস্কারের প্রতিশ্রুতি:

রেশনে ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল (ePOS) মেশিন ও আধার-সংযুক্ত বায়োমেট্রিক যাচাই ব্যবস্থা চালু করার পেছনে অর্থনৈতিক যুক্তিটি মজবুত। যদি প্রতিটি লেনদেন ডিজিটালি নথিভুক্ত হয়, তাহলে বরাদ্দ ও রেশন বিতরণের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'Ghost Beneficiary' বা মৃত ব্যক্তির নামে শস্য তোলা বন্ধ হবে। একটি নির্দিষ্ট তথ্যভাণ্ডারে সব তথ্য থাকলে নজরদারি সহজ হবে। পশ্চিমবঙ্গে ePOS চালুর পরে কিছু ইতিবাচক ফলাফল দেখা গেছে। নথিভুক্ত Ghost Beneficiary-র সংখ্যা কমেছে এবং লেনদেনের স্বচ্ছতা

বেড়েছে। 'One Nation One Ration Card' প্রকল্পে যোগ দেওয়ার পর পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যের বাইরেও রেশন নিতে পারছেন। এগুলো সত্যিকারের উন্নতি।

(খ) ডিজিটাল ডিভাইড: বিভেদীকরন:

কিন্তু প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধানের একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা আছে — মনে করা হয় যে সকল উপকারভোগী সমানভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাপ্রাপ্ত। কিন্তু বাস্তবে 'Digital Divide' এর দ্বারা: যারা প্রযুক্তিতে সহজ, তারা সুবিধা পায় , যারা নয়, তারা আরও অসুবিধায় পড়ে ও বঞ্চিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই বিভাজনের সুনির্দিষ্ট রূপ দেখা যায় : বৃদ্ধা বিধবা যার আঙুলের ছাপ আর মেশিন আসে না— তিনি বায়োমেট্রিক ফেলিওর এর শিকার। ইটভাটার শ্রমিক যার হাতের চামড়া ক্ষয়ে গেছে পরিশ্রমের কারনে— তার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কাজ করে না। দুর্যোগের পর নেটওয়ার্ক না থাকলে পুরো ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়ে। এই সমস্যাটি কেবল প্রযুক্তিগত নয়, সামাজিক। যে মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি রেশনের উপর নির্ভরশীল, তারাই প্রায়ই সবচেয়ে বেশি প্রযুক্তির কারনে সমস্যায় পড়ে ও বঞ্চিত হয় । ফলে তথ্যপ্রযুক্তিকরণ নিজের অজান্তেই একটি নতুন বৈষম্য তৈরি করে ।

পরিযায়ী শ্রমিক ও রেশনিং ব্যবস্থা:

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থার কাঠামো মূলত স্থায়ী বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখে তৈরি, ফলে জীবিকার সন্ধানে এক জেলা বা রাজ্য থেকে অন্যত্র যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা এই ব্যবস্থার বাইরে পড়ে যান। রেশন কার্ড নির্দিষ্ট ঠিকানার সঙ্গে যুক্ত থাকায় কর্মস্থলে রেশন মেলে না, আবার বাড়িতে না থাকায় সেখানকার রেশনও তোলা হয় না— এই দ্বিমুখী বঞ্চনায় পরিবারটি খাদ্য সুরক্ষার বাইরে চলে যায়। ২০১৯ সালে চালু হওয়া One Nation One Ration Card (ONORC) প্রকল্প এই সমস্যার সমাধান দেওয়ার কথা থাকলেও সচেতনতার অভাব ও ধীর বাস্তবায়নের কারণে বহু শ্রমিক এখনও এর সুবিধা পাচ্ছেন না। ২০২০ সালের কোভিড লকডাউনে এই সংকট চরম আকার ধারণ করে, যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় না পেয়েছেন মজুরি, না পেয়েছেন রেশন। তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেশনিং ব্যবস্থাকে ঠিকানাভিত্তিক কাঠামো থেকে বের করে ব্যক্তিভিত্তিক পরিচয়ের উপর দাঁড় করানো বাধ্যতামুলক হয়ে পড়ে।

সামাজিক বর্গ ও রেশন:

(ক) লিঙ্গ বৈষম্য ও খাদ্য বিতরণ:

পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ সমান হয় না— এটি পুষ্টি গবেষণায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলার গ্রামীণ পরিবারে পুরুষরা প্রথমে খান, মহিলারা পরে। পরিবারে সংকটের সময় মহিলারাই বেশি ত্যাগ করেন। ফলে রেশনে পরিবারের জন্য শস্য আসলেও সেটা সমানভাবে পৌঁছায় না। মহিলা ও মেয়েশিশুরা পুষ্টিহীনতায় বেশি ভোগেন। এই বাস্তবতায় শুধু পরিবারকে শস্য দিলে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত হয় না। কিছু গবেষক প্রস্তাব করেছেন যে রেশন কার্ড সরাসরি মহিলাদের নামে হওয়া উচিত এবং মহিলারাই রেশন তুলবেন — এতে পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণে লিঙ্গসমতার দিকে একটি পদক্ষেপ হয়। কিছু রাজ্যে এটি করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও কিছুটা চলছে, কিন্তু পুরোপুরি নিয়ম হয়নি।

(খ) শহরের অসংগঠিত শ্রমিক:

কলকাতা ও শহরতলির বস্তিবাসী, হকার, রিকশাচালক, গৃহকর্মী— এই মানুষগুলো প্রায়ই ঠিকানার অভাবে বা নথিপত্রের সমস্যায় রেশন কার্ড পাচ্ছেন না। তারা শহরে আছেন কিন্তু শহরের আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্বের

সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ভাড়াটে হিসেবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন বলে স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণপত্র নেই। এটি আধুনিক নগরায়নের একটি নতুন সামাজিক সংকট।

এছাড়াও সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ভাষাগত বাধা, তথ্যের অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে দূরে রাখে। সুতরাং রেশনিং ব্যবস্থার সমস্যা শুধু প্রশাসনিক নয়, এটি গভীরভাবে সামাজিক বর্গবিভাজনের সঙ্গে সম্পর্কিত — এবং সেই বৈষম্য দূর না করলে কোনো সংস্কারই প্রকৃত অর্থে কার্যকর হবে না।

পুষ্টি শুধু ক্যালরি নয়:

রেশনিং ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্র মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে এই ব্যবস্থা কেবল চাল ও গম বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের পেট ভরালেও শরীর ও মনের সামগ্রিক বিকাশের জন্য যে বৈচিত্র্যময় পুষ্টির প্রয়োজন, তা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। একজন সুস্থ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কার্বোহাইড্রেটের পাশাপাশি প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ জাতীয় খাবার অপরিহার্য। কিন্তু রেশনের মাধ্যমে যা মেলে তা কার্যত শুধুই শর্করা। দরিদ্র পরিবারগুলো রেশনের চাল ও আটার উপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে বাজার থেকে ডাল, সবজি, ডিম বা মাছ কেনার সামর্থ্য তাদের আর থাকে না। ফলে পরিবারের সদস্যরা, বিশেষত শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা, দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টি ও রক্তাল্পতার শিকার হন। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অপুষ্টি কেবল একটি স্বাস্থ্য সমস্যা নয় — এটি একটি গভীর অর্থনৈতিক সংকটও বটে। অপুষ্ট শিশু বিদ্যালয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, তার শেখার ক্ষমতা কমে যায় এবং ভবিষ্যতে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সংকুচিত হয়। অপুষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কম পরিশ্রম করতে পারেন, বেশি অসুস্থ হন এবং চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে আরও দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে যান । এইভাবে অপুষ্টি একটি বিশাল সমস্যা যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে তোলে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই সমস্যা আরও জটিল। রাজ্যের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষত সুন্দরবন, জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলে, পুষ্টিহীনতা এখনও একটি গুরুতর সমস্যা। মিড-ডে মিল ও অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুপুষ্টির কিছুটা উন্নতি হলেও প্রাপ্তবয়স্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা এখনও অনেকাংশে উপেক্ষিত।

তাই রেশনিং ব্যবস্থাকে যদি সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের হাতিয়ার করতে হয়, তাহলে শুধু ক্যালরি সরবরাহের গণ্ডি পেরিয়ে ডাল, তেল, পুষ্টিকর বিস্কুট বা ফর্টিফাইড খাদ্যপণ্য রেশনের আওতায় আনা দরকার। উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা দেখায় যে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে পুষ্টির বৈচিত্র্য নিশ্চিত করলে দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য ব্যয় কমে, শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং সামগ্রিক মানব উন্নয়ন সূচক উন্নত হয়। শুধু ক্যালরি নয়, সমৃদ্ধ জীবনের জন্য চাই সমৃদ্ধ পুষ্টি— এই দৃষ্টিভঙ্গিই হওয়া উচিত আগামী দিনের রেশন নীতির মূল ভিত্তি।

পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক অডিট ও দায়বদ্ধতা: বর্তমান পরিস্থিতি ও গৃহীত পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থায় সামাজিক অডিটকে স্বাধীন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আনার চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজ্য সরকার স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। জবাবদিহির প্রশ্নে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে ডিজিটায়নের মাধ্যমে। রাজ্য সরকার রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্ত করার জন্য বাধ্যতামূলক eKYC প্রক্রিয়া চালু করেছে, যার মূল লক্ষ্য হলো নকল ও ভুয়ো রেশন

কার্ড বাতিল করা এবং ভর্তুকি সঠিক সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই পদক্ষেপ কিছুটা হলেও দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করেছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর সপ্তাহে সাত দিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দুটি টোল-ফ্রি নম্বর— ১৯৬৭ এবং ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫— চালু রেখেছে, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারেন। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে এই তথ্য এখনও পুরোপুরি পৌঁছায়নি। ২০২৫ সালে রেশন দুর্নীতি প্রতিরোধে রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান চালানোর কথাও খাদ্য দপ্তর ঘোষণা করেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ডিজিটায়ন, eKYC এবং টোল-ফ্রি অভিযোগ ব্যবস্থা কিছুটা অগ্রগতির ইঙ্গিত দিলেও রেশনিং ব্যবস্থায় গ্রামসভা-ভিত্তিক স্বাধীন সামাজিক অডিটের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও অনুপস্থিত। MGNREGA-র মতো রেশন বিতরণেও যদি বাধ্যতামূলক সামাজিক অডিট চালু না হয়, তাহলে প্রযুক্তিগত সংস্কার যতই হোক না কেন, প্রকৃত জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

ভবিষ্যতের পথে করনীয়:

(ক) আর্থনৈতিক সুপারিশ:

প্রথমত, রেশন ডিলারদের কমিশন কাঠামো এমনভাবে পুনর্গঠন করা দরকার যাতে সৎভাবে ব্যবসা চালানো আর্থিকভাবে সম্ভব হয়। প্রতি কুইন্টালে উপযুক্ত কমিশন নির্ধারণ করা এবং সেটা নিয়মিত মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, উপকারভোগীর তালিকা সময়ের ভিত্তিতে যাচাই করা দরকার— প্রতি পাঁচ বছরে বা প্রতিটি জনগণনার পরে নিরপেক্ষভাবে আপডেট হওয়া উচিত। এই প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, স্বাধীন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় হওয়া দরকার।

তৃতীয়ত, রেশনে ডাল ও ভোজ্যতেল যোগ করার বিষয়টা নীতিগত অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এর অতিরিক্ত ব্যয়ের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যব্যয় হ্রাসের হিসাব করলে এটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

(খ) সামাজিক সুপারিশ:

প্রথমত, রেশন কার্ড সরাসরি পরিবারের নারী সদস্যের নামে করা এবং নারীর হাতে শস্য তুলে দেওয়া— এটি লিঙ্গসমতার দিকে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শহরের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রেশন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা দরকার।

তৃতীয়ত, রেশনিং ব্যবস্থার সামাজিক অডিটকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া দরকার। প্রতিটি ওয়ার্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েতে বছরে অন্তত একবার প্রকাশ্য সভায় রেশন ডিলারের হিসাব পেশ করা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

চতুর্থত, প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান যখনই চালু হবে, তখন বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে — বায়োমেট্রিক ব্যর্থ হলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রেশন দেওয়ার সুযোগ থাকা চাই।

উপসংহার:

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থার আর্থসামাজিক রুপান্তর বিশ্লেষণ করতে বসে একটা বিষয় বারবার স্পষ্ট হয়— খাদ্যনীতি আসলে একটি দেশের মানবনীতির প্রতিফলন। দেশ তার সবচেয়ে দুর্বল মানুষটিকে কতটা মূল্য দেয়, সেই পরিমাপই খাদ্যনীতিতে প্রকাশ পায়। ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ দেখিয়েছিল একমাত্র বাজার একাই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ১৯৫৯ সালের আন্দোলন দেখিয়েছিল মানুষ চিরদিন চুপ থাকে না, একসময় তারা ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়। বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার ও রেশন সম্প্রসারণ নীতি

দেখিয়েছিল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কিছুটা পার্থক্য আনতে পারে। তৃণমূলের খাদ্য সাথী প্রকল্প দেখিয়েছে কল্যাণ রাজনীতি আজও কার্যকর অস্ত্র হতে পারে । কিন্তু প্রতিটি পর্যায়েই একটি প্রশ্ন থেকেই যায় এই ব্যবস্থা কি মানুষের মর্যাদা বাড়াচ্ছে, নাকি তাদের নির্ভরশীল করে রাখছে? সত্যিকারের খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ শুধু পেটে ভাত নয়— পুষ্টিকর খাবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থান মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ জীবন পাওয়ার সুযোগ। রেশনিং সেই বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে একটি পদক্ষেপ হতে পারে, কিন্তু সেটা যদি রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তাহলে মানুষের সত্যিকারের ক্ষমতায়নের দিকে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য সামনের পথ হল - একটি স্বচ্ছ দায়বদ্ধতামুলক, পুষ্টিকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতমুক্ত গণবণ্টন ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি নাগরিক তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সেই অধিকার দাবি করার সাহস ও সুযোগ পাবে । এই লক্ষ্যটা এখনও পূর্ণ হয়নি, কিন্তু একেবারেই অসম্ভব নয়।

Bibliography:

1. Sen, Amartya. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press.
2. Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
3. Bose, Sugata. (1986). Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics, 1919–1947. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Howes, S., & Jha, S. (1992). Urban bias in Indian public distribution system. Economic and Political Weekly, 27(19), 1022–1030.
5. Khera, Reetika. (2011). Revival of the public distribution system: Evidence and explanations. Economic and Political Weekly, 46(44–45), 36–50.
6. ভারত সরকার। (২০১৩). National Food Security Act, 2013. নতুন দিল্লি: খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রণালয়।
7. পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০১৬). খাদ্যসাথী প্রকল্প — নির্দেশিকা ও বাস্তবায়ন কাঠামো। কলকাতা: খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ।
8. Planning Commission of India. (2005). Performance Evaluation of Targeted Public Distribution System (TPDS). New Delhi: Programme Evaluation Organisation.
9. পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর। (২০২৪). রেশনিং সংক্রান্ত তথ্য। সংগ্রহের তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৫। https://wbpds.wb.gov.in
10. ভারত সরকার। (২০২৪). Aadhaar-enabled Public Distribution System (AePDS). সংগ্রহের তারিখ: ২০ জানুয়ারি ২০২৫। https://aepds.gov.in
11. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. সংগ্রহের তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। https://www.fao.org/publications
12. Right to Food Campaign India. (2024). ভারতে খাদ্যের অধিকার: পর্যালোচনা ও সংস্কার প্রস্তাব। সংগ্রহের তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। https://www.righttofoodindia.org